সংবাদ

তারিখ 24 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

জাতির মেরুদণ্ড আজ মহাবিপদে

শামশাদ মান্নান

মেরুদণ্ডহীন মানুষ। মেরুদণ্ডহীন জাতি। ভাবতেই কেমন শিউরে উঠতে হয়। মেরুদণ্ডই তো সব। তা না হলে সে যেই হোক- যত উঁচু, যত বড়- মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সেই মেরুদণ্ড আজ মহাবিপদে। মেরুদণ্ডের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। অথচ সেই শিক্ষার মান, উপকরণ ও ব্যবস্থাপনার আজ বড়ই বেহাল অবস্থা। শিক্ষার সবচেয়ে অন্যতম উপকরণ হচ্ছে বই। বই রচনা, মুদ্রণ আর বণ্টন নিয়ে তুঘলকি কাণ্ডকারখানা চলছে। এমনি বই পড়া তো হয় না প্রায়। পাঠ্যবই ছাড়া অন্যসব বই পড়ুয়ার সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সৈয়দ মুজতবা আলীর সেই ক্রেতা-বিক্রেতার কথোপকথন নিশ্চয়ই অনেকেরই মনে আছে। কোন জিনিসই ক্রেতার পছন্দ হচ্ছে না যখন তখন বিক্রেতা বইয়ের কথা বলতেই ক্রেতা বলে উঠলেন সেটাও একটা বাড়িতে আছে। কী মর্যাদাই না বই পেয়েছে- যেন বস্ত্রহীন রাজামশাই! হায়রে বই! কেন যে লেখক আর বইয়ের জন্ম হয়। কেন যে মানুষ বই লিখে। বই তো ঘরসজ্জার জিনিস নয়। নয় কোন চোখ ধাঁধানো অলংকার।

তবু জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষার খাতিরে বেশ কিছু বই তো লিখতেই হয়- এরপর মুদ্রণ আর বণ্টন। সময়মতো নির্ভুলভাবে ছাপিয়ে এসব বই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতর আছে। সেসব দফতরে কত নামিদামি, হোমরা চোমরা কর্তাব্যক্তি আছেন। কত লম্ফঝম্প, হাঁকডাক, আস্ফালন আর আয়োজন আছে। সবই বৃথা যায় যখন ফলাফল আশাব্যঞ্জক হয় না। কাম্য শতভাগ নম্বরের পরিবর্তে ন্যূনতম উত্তীর্ণ হতেই ব্যর্থ হয় সব প্রয়াস। অযোগ্যতার ছাপ বইয়ের মলাট ছাড়িয়ে যখন পাতায় পাতায়, শব্দ আর অক্ষরে ছড়িয়ে যায় তখন জাতির মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দৃঢ়ভাবে সোজা দাঁড়িয়ে থাকার বদলে মেরুদণ্ড সটান শুয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অস্তিম যাত্রার বুঝি আর দেরি নেই। বহুল অত্যাচার জর্জরিত মেরুদণ্ডের তো প্রাণ আছে। কতটা বা তার সহ্য ক্ষমতা। লজ্জা আর অপমানে বেচারা একেবারে কাহিল।

তারপরও আশার আলো আছে। আলো জ্বালানোর মানুষ আছে। আমার বাবার কাছে শুনেছি ঢাকা-কলকাতায় এক সময় সন্ধ্যার আগে পৌরসভার একদল কর্মী রাস্তায় রাস্তায় বাতি জ্বালিয়ে যেতেন- অন্ধকার দূর হতো, আলোকিত হতো চারপাশ। আবার দিনের আলো ফুটবার আগে আরেক দল মানুষ ভিস্তিতে পানি এনে রাস্তা ধুয়ে দিত- আবর্জনা দূর করত। সেসব ভিস্তিওয়ালাদেরও দেখা হয়নি কখনও। নিজ চোখে কোনদিনও দেখা হয়নি সেই আলো জ্বালানো আর অপরিচ্ছন্নতা দূর করা মানুষগুলোকে। কিন্তু দেখেছি একজনকে খুব কাছ থেকে, রেখেওছি ভীষণ কাছে-অন্তরে, হৃদয় দিয়ে ঘিরে। তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার। অসংখ্য আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজের ছাত্র হওয়ার সুবাদে স্যারকে সরাসরি শ্রেণীকক্ষে পেয়েছি। ধন্য হয়েছি তার মতো এক জ্ঞানী অমায়িক মানুষের সান্নিধ্যে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পড়াতেন দোতালার শ্রেণীকক্ষে। আসলে পড়াতেন বললে ভুল বলা হবে। তিনি খুব আরামদায়ক এক ভ্রমণে নিয়ে যেতেন অন্য এক রাজ্যে- জ্ঞানের রাজ্যের স্বপ্নপুরীতে। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কেটে যেত সময়। সারা ক্লাসে পিনপতন স্তব্ধতা আর মাঝে মাঝে হাসির উচ্ছ্বাস। তন্ময় হয়ে স্যারের কথা শুনতাম। ভাবতাম অনাদিকাল ধরে চলুক তার উপস্থিতি। শ্রেণীকক্ষে তিল ধারনের স্থান থাকত না। কক্ষের ভেতর এমনকি দরজা, জানালায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত শিক্ষার্থীরা। মনে পড়ে কিছু সহপাঠীর কথা যারা জরুরি ক্লাস বাদ দিয়ে কমনরুম, ক্যান্টিন, বলাকা, নিউমার্কেট বা অন্য কোথাও সময় কাটাতে ভালোবাসত। ওরাও স্যারের ক্লাসে উপস্থিত হতে ভুল করত না। বাণিজ্য বিভাগের ক্লাসে মাঝে মাঝে বিজ্ঞান বা কলা বিভাগের ছাত্রদের দেখা গেছে শুধু স্যারের আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তার কারণে। ঢাকা কলেজের বোটানি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবদুল মজিদ স্যারের ছেলে প্রকৌশলী মঞ্জুর কাদের [অপেল], আমার চাচাতো ভাই, পারতপক্ষে বাংলা বা ইংরেজি ক্লাসে উপস্থিত থাকত না। কিন্তু তাকেও মাঝে মাঝে শুধু স্যারের ক্লাসে দেখা যেত। ও ধূমকেতুর মতো হাজির হতো স্যারের টানে।

একদিনের কথা খুব মনে পড়ে। ক্লাস চলছে। স্যার উপস্থিত। হিমালয়ের মতো বিশাল উচ্চতা নিয়ে সামনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে। আমি প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে যথারীতি প্রথম বেঞ্চে বসা। চারদিকে একেবারে পিনপতন নিস্তব্ধতা। স্যার তার সহজাত ভঙ্গিমায় অমৃত বর্ষণ করে চলেছেন। হঠাৎ একটা দশ পয়সার ধাতব মুদ্রা উড়ে এসে স্যারের পায়ের কাছে জুড়ে বসল। তিনি থেমে গেলেন। মুখ থমথমে- কিছুটা লালও মনে হচ্ছিল। খুবই নিকটে থাকবার ফলে পুরা ব্যাপারটা চোখের সমুখেই ঘটছিল- অভূতপূর্ব, তাই পুরাপুরি অপ্রস্তুত। শিউরে উঠলাম- কী জানি কী ঘটে। কোন বা অনাসৃষ্টি ঘটে। হ্যাঁ ঘটল বটে। তবে সৃষ্টি হলো এক ইতিহাস- যা কোনদিনই ভুলবার নয়, তাই ভুলিনি এত বছর পরেও। পৃথিবীতে আসা এক মহান মানুষের দর্শন পেয়ে ধন্য হলাম। মুগ্ধ হলাম। বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবিষ্ট হয়ে বসে রইলাম। স্যার দাঁড়ানো অবস্থায় ঝুঁকে কাঠের মঞ্চের ওপর থেকে পয়সাটা তুলে নিলেন। নিবিষ্ট নয়নে দেখলেন। কিঞ্চিত কী ভাবলেন ক্ষণিকের জন্য। তার বিস্মিত-বিব্রত মুখজুড়ে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠে স্থায়ী হলো। মেঘ সরে গেল। স্যার বললেন- 'আমি খুব খুশি। অন্যরা তো শুধু শুনেই যাচ্ছে। কিন্তু এখানে অন্তত একজন সমঝদার আছে যে শুধু নিতেই জানে না, দিতেও জানে।' ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। অবশ্য এই বিরল কৃতিত্বের দাবি নিয়ে কেউ উঠে দাঁড়াবার দুঃসাহস দেখায়নি- দেখাবার কথাও নয়।

বাংলাদেশে বই পড়া আন্দোলনের পথিকৃৎ, প্রাণপুরুষ, আলোকিত মানুষ গড়ার সুনিপুণ কারিগর শ্রদ্ধেয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার দীর্ঘ বহু বছর ধরে বই পাঠক বৃদ্ধির আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত সাধনায় তিনি যখন সফলতার তুঙ্গে, তখন 'কাজে না বড় হয়ে কথায় বড় হওয়া' কিছু মানুষের অর্বাচীনতার বাণে বিদ্ধ হয়েছে জাতির মেরুদণ্ড। হুমকির মুখে পড়েছে দেশের শিক্ষার মান। জাতির বংশধরদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। 'ও' তে 'ওড়না চাই' পড়তে হচ্ছে আর 'আ' তে আমগাছ দেখাতে ছাগল টেনে আনা হচ্ছে পুস্তকের পাতায়। আরও আছে। স্যারের ছড়ানো আলোকিত পথকে আঁধারে ঢাকার অপচেষ্টা চলছে। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। প্রায় ১৪ লাখ পাঠ্যবই মুদ্রণের পর অবশিষ্ট মুদ্রণ স্থগিত রেখে সংশ্লিষ্ট অনেককে অবগত না করে বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন করা হয়েছে। কোমলমতি শিশুদের হৃদয় অঙ্গনে সাম্প্রদায়িক 'ষাঁড়গরু' দাবড়ানোর নীলনকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রগতিশীল লেখকদের সাহিত্যকর্ম থেকে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের বঞ্চিত করার অশুভ পাঁয়তারা শুরু হয়েছে। এসব হঠকারী আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে যেয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) নষ্ট করেছে কয়েক কোটি টাকা যেখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করতে পারে না।

বিকৃত বানান ও বাক্য এমনকি অপ্রয়োজনীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে। জাতির পিতা ও তার শ্রদ্ধেয় মায়ের নাম পর্যন্ত রেহাই পায়নি এই বিকৃতির হাত থেকে। কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি বিকৃতভাবে উপস্থাপনকারী কোন 'আদর্শে' দীক্ষিত এবং ভুল না বলে ভণ্ডামির নেশায় বুঁদ হয়ে কোন ভয়ঙ্কর সর্বনাশের খেলায় মেতে উঠেছে তা খুব জানতে ইচ্ছা করে। ১৪ লাখ মুদ্রিত পুস্তক যেমন গুদামে আটকে রাখা উচিত নয় তেমনি জাতির ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়া একেবারেই সমীচীন নয়। একটা এগিয়ে যাওয়া সমাজকে ঠেলে পিছিয়ে অন্ধকারে নেয়ার দায় কে নেবে?